KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮/১০৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২ যাদবপুর,
Collection : KLMLGK	Publisher : রূপালী রায় (2/3) রুমা রায় (5)
Title : অরণ্য (ARANYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 2/3 5	Year of Publication : 1972 1975
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : মৃণাল রায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অরণ্য

দেশের কল্যাণে

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

★

আজই যে কোন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে গিয়ে
ছোট পরিবার সম্পর্কে খবর নিন।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা—২৩০/৭৫-৭৬ পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ
পরিকল্পনা থেকে প্রচারিত।

মননশীল সাহিত্য পত্রিকা ॥ বিশেষ সংখ্যা ॥ সূচীপত্র

প্রবন্ধ :

এখনকার কবিতার সমালোচনা ॥ শান্তিকুমার ঘোষ

গল্প :

চাঁদের আলোয় পৃথিবী ॥ সমীর রক্ষিত
শ্যামল অনুরাগে ॥ রবীন্দ্র গুহ
তুমি আছো আমি আছি ॥ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণচূড়ার রঙ ॥ জয়া রায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কবিতা :

তার দেখা ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায়
তুমি ॥ কৃষ্ণ ধর
সুংগলে, পালামপুরে ॥ হরপ্রসাদ মিত্র
কৌটোগুলো ॥ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কবিতার দিন ॥ স্বপন রায়
কাকে ভালবাসা বলে ॥ কবিতা সিংহ
তোমার শরীর জুড়ে অন্ধকার ॥ অসীম রেজ
তিন টুকরো ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক
ছত্রাকের প্রতি ॥ অসীম বসু

বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র ★
স্থাপিত ১৯৭

প্রচ্ছদ : অন্নদা মুন্সী

সম্পাদক : স্বপন রায়

সহঃ সম্পাদক : রঞ্জন পাল রায়

কার্য্যালয় : ৮/১০৩, বিজয়গড় ● যাদবপুর ● কলিকাতা-৭০০০৩২

প্রবন্ধ

এখনকার কবিতার সমালোচনা

শান্তিকুমার ঘোষ

এক এক সময় মনে হয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যেত তাহ'লে শিল্পসৃষ্টির কাজে একটা উৎকর্ষ মান বজায় রাখা সম্ভব হ'ত। যারা অক্ষম শৃঙ্খলা বোধহীন, প্লেটোর প্রস্তাব মতো নগর প্রাচীরে না হোক, তাদের কাব্যসংসার থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেওয়া যেত। যারা সমাজে আর কোনো কাজে লাগলো না সেই সব প্রচ্ছন্ন বেকারজনরা অবাধে-পদ্যরচনার কামার-শালে ভিড় বাড়াতে পারতো না। শিল্পনির্মাণের জন্য যে চাই যোগ্যতা অর্জন, পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার সেটা আপামর লোক-সাধারণ আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতাম।

কবিতা জিনিষটা এমন নয় যা বছরের ছটা ঋতুতে সমান ফলানো যায়। তার জন্যে দরকার অনুকূল জল-হাওয়া, আনন্দিত স্বতস্ফূর্তণের। সম্পাদক দরোজা খুলে দিয়েছেন, ছাপাখানা ও প্রস্তুত সুতরাং যে করে হোক লেখা যোগান দিতে হবে এই তাগিদ আর যাই হোক সৃজনশীল অনুপ্রেরণা নয়। মুদ্রন ও প্রকাশনা জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, মার্কিন ভূখণ্ডে দৈত্যের মতো প্রচারের মাধ্যমে নিজেরাই যেমন চাহিদা সৃষ্টি করে সেরকম বহরের ব্যূহবদ্ধ ব্যবস্থাপনা আর সাহিত্য শিল্পসৃষ্টি কর্মে শব্দ শব্দবন্ধ চিত্রকল্প ছন্দমিল নিয়ে নিরন্তর প্রযত্ন প্রয়াস কি এক প্রক্রিয়া?

অপরিণত সাহিত্যে যেমন হয়ে থাকে, বাংলা কবিতায় সেরকম ভাবপ্রবণতার বান ডেকেছে। আত্মপ্রধান হ'লেই পাঠকের কাছে

কবিতার আবেদন বাড়ে না। অঙ্কের যুক্তিবিজ্ঞানের যুগে তুরি পরিমাণের তুচ্ছ রচনা বাঙালী মানসের অধঃপতনের নির্দেশক। সম্ভবত এক ধরণের আত্মতৃপ্তি থেকে—মৌলিক সৃষ্টি নয়, নীরস আকর্ষণ শূন্য গতানুগতিক লেখার এই প্রাবন?

অন্য এক খাতে বাংলা কবিতা ধারা বইছে। তা হ'ল অযৌক্তিত কিন্তুতকিমাকার কবিতা। সমৃদ্ধ দেশে মানুষের মৌল অনুভূতিগুলো ক্ষীন দুর্বল হয়ে আসতে পারে। কিন্তু দরিদ্র দেশে দয়া ভালোবাসা-ভক্তি-নন্‌সেন্স কবিতা সেক্ষেত্রে কতদূর প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ সেরকম কবিতায় পাঠকের সাড়া কতখানি পাওয়া যাবে তা বলা মুশকিল। তার চেয়ে বেশী, এ জাতের কবিতা একটা মহান্ তাৎপর্য বা উচ্চতা-অর্জনে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা আছে। শেষ পর্যন্ত, কবিতা বাস্তব জীবনকে দূরে পরিহার করে অগ্রসর হ'তে পারে না। 'বাস্তব' কথাটাকে গূঢ় বা ব্যপক অর্থে বলতে চাইছি ('পরাবাস্তব' বা 'অতিবাস্তব' অভিপ্রায়েও একথা খাটে)। একসময় বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমনতর হাস্যকর অভিযোগ উঠেছিল যে, তাঁর শিল্পসৃষ্টি বাস্তব জীবনের সংসর্গ এড়িয়ে চলে—তার সঙ্গে পৃথিবীর ধুলোমাটির কোনো সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ বিষয়ে এক জায়গায় খেদ করেছেন:

"প্রেমের অভিষেক' এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম, তাতে কেরানি জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম; 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় বাঙালি ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকে কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতে বিচলিত হইনি, হয়তো দুচারটে লাইন বাদ পড়েছে। লোক জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন।"

(—কবির ভনিতা, ১৩৭৫, পৃষ্ঠা ৩৪)

কবিত্ব উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের যে বাস্তববোধ স্পষ্ট হবে এটা আশা করা ঠিক নয়। ব্যক্তিত্বের ক্রম-বিকাশের সমসময়ে

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির ধারনা গড়ে ওঠে। অবশ্য প্রথমদিকে অর্থাৎ তরুণ বয়সে, ইংরেজীতে যাকে বলে fancy, সেই খোশ-খেয়াল বা সহজে আকৃষ্ট হওয়ার একটা প্রবণতা থাকতে পারে। পরে যৌবনকালে, দেখাযায়, সত্যিকার কল্পনাশক্তি বা imagination প্রবল হয়ে উঠেছে। এই অপরাজেয় কল্পনাশক্তি জোনাকির স্পন্দন ক্ষেত্রে নক্ষত্রবিকীরণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হ'তে পারে। কিন্তু আলৌকিক দৃষ্টির অধিকারী অর্থাৎ visionary হওয়ার সৌভাগ্য লাভের জন্য কাউকে অপেক্ষা করতে হয় পরিণত বয়স অবধি। এর একটা চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে সেকালের রামপ্রসাদ সেন অথবা একালের জীবনানন্দ দাশের নাম করা যেতে পারে। বাংলা কাব্যে এরা হলেন ভূতগ্রস্ত কবি।

কবির সারাজীবনের যা শিল্পফল সে-ই কবিকর্ম কি শেষের বিশ্লেষণে একটা Language Structure বা ভাষার গঠন ছাড়া অন্য কিছু? আবহমান দেশকালের ঐতিহ্য যেমন এই অবয়বের ভিত্তিভূমি রচনা করে, আগামী দিনের উদ্‌ভাবনা সেরকম তাকে স্থায় স্থাপত্য-সংক্রান্ত নির্দ্দিষ্ট আকার। গোটা একটা সভ্যতার উত্থান-পতনের মতো, মনে হয়, কাব্যসাহিত্যের অগ্রসরণ প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বাঁধা পড়ে ঐ অক্ষরমালার শৃঙ্খলে। যুদ্ধ এবং শান্তি, পাপবুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধির বেদনা-ময় সংঘাত, বায়ুহীণ প্রানহীণ মহাশূন্যে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস অবিশ্বাস্যরকম রূপ ও আয়তন পায় অমর সাহিত্যে।

কবি ভাষা বিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলা কাব্য কত দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছে তা বোঝার জন্য তিনটি মাইলষ্টোন্ বা দূরত্ব নির্দেশক প্রস্তরফলক ধরা যেতে পারে:—

(১) "সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্তে বাজিয়াছিল, তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে—থেমে—যাওয়া বাণী।
(ক্ষণিকা: পূরবী—১৯২৪)

(২) "দ্রোনফুল লেগে আছে মেরুণ শাড়িতে তার—নিম আম-লকী পাতা হাল্কা বাতাসে
চুলেরওপরে উড়ে উড়ে পড়ে—মুখে চোখে শরীরের সর্বস্বতা ভ'রে,
কঠিন এ সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে করে।"
(জার্নাল: ১৩৫৬: জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(৩) ঐ বৈশাখী! দক্ষিণে তার চৈতী ঘূর্ণি চুপ
কালবৈশাখী! দক্ষিণে তার উড়েছে সরীসৃপ,
উত্তরে তার উমার আরাম কিংবা সীতা
জনক দুহিতা আকাশে মেলায় মাটির জম্বুদ্বীপ,
জামদগ্নের হরধনু বাজে, পৃথিবী দীপান্বিতা।
(রামধনু: অন্বিষ্ট: ১৯৪৭-৪৯)

স্বভাবত প্রশ্ন উঠবে যে, এখানকার কাব্য কি, এই মানদণ্ডের বিচারে, অতীতের কবিকৃতিকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে? কেউ কেউ বলবেন, সময়ের ঢেউ খানিকটা সরে না গেলে তা স্পষ্ট হবে না। কারো মতে, আবার, মূল্যায়ণের মাপকাঠি কালে কালে পালটায়। এখন দিবসশেষ—আলো দ্রুত পড়ে আসছে। অদূরে উদ্ভাসিত স্কোর বোর্ডের পটভূমিতে মুখোমুখি জনা তেরো মানুষ খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে। আলোর অভাবের জন্যে আম্‌পায়্যারদের কাছে আবেদন করা হয়েছে কি?

———

FOR COUGH AND COLD
USE
GHAZNI SYRUP
GHAZNI PHARMACY
66, COLOOTOLA STREET,
CALCUTTA-I

গল্প

চাঁদের আলোয় পৃথিবী

সমীর রক্ষিত

—ডু ইউ লাইক টু হ্যাভ্ আ কোক? সঞ্জয় একটা কোকাকোলা এগিয়ে ধরে শুভোর মুখের সামনে।

শুভো তৎক্ষণাৎ বাঁ পায়ে একটা লাথি তোলে, বলে-হারামী। মাল ঝেড়ে শালা এখন কোকাকোলা দিয়ে ভোলাচ্ছে। লাথি তোলে শুভো কিন্তু আঘাত করে না, সে সাহস তার নেই। সঞ্জয়ের ছফুটের কাছাকাছি উঁচু শরীর, জবরদস্ত চওড়া হাড়ের কাঠামো, ফর্সা রঙ, ছোট করে ছাঁটা চুল। সঞ্জয়ের একটা ঘুষিও সইতে পারবে না শুভো কিম্বা শঙ্কর কিম্বা জয়।

অথচ ওরা তিনজনের প্রত্যেকে সঞ্জয়ের উপর ক্ষেপে আছে। সঞ্জয় কিছু না বলে নিজেই কোকাকোলার ষ্ট্র মুখে পোড়ে। যতজোরে টানলে চলে তারও চেয়ে বেশী জোরে টানে। তারপর দম নিয়ে বলে—মিস করলি।

রেকর্ডে শানাই বাজছে। অদূরে দীপান্বিতা হলের সামনে মাষ্টারী ভেপার ল্যাম্প জ্বলছে। দু দুটো গেটে সমান ভীড়। প্রাইভেট কারের ছড়াছড়ি, ছড়াছড়ি জমকালো শাড়ির, ধুতি পাঞ্জাবীর; সেন্টের গন্ধ পেয়ে বাতাস পাগলা হয়ে ছোটাছোটি করছে।

দীপান্বিতা হলে একসঙ্গে ছটা বিয়ে কিংবা বৌভাত হতে পারে। আজ একটাতে বৌভাত আরকটাতে বিয়ে হচ্ছে। বাড়িওলা মিষ্টার মুখার্জিকে সঞ্জয় কব্জা করে রেখেছে। যাঁরা ভাড়া নিয়েছে তাদের প্রত্যেককে সঞ্জয় বলেছে—আমি ভাড়ার বন্দোবস্ত করে দেব, কিন্তু

আমাকে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে। না হলে আপনাদের ফাংশানে ঝামেলা হবে।

সোজাসুজি কোন পার্টিকেই সঞ্জয় মিষ্টার মুখার্জির কাছে ঘেষতে দেয় না। গোড়াতে সঞ্জয় শুভো এবং জয়ও বখরা পেত এখন সঞ্জয় একাই লুটে নিচ্ছে। জয় ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলে—সঞ্জয় আমরা কিন্তু বিয়ে বাড়িতে ঝামেলা করব। শালা বোম ছুঁড়ব।

সঞ্জয় একটা ঢেকুর তুলে বলে—সেজন্যেই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। ঝামেলা করবি তো জ্যান্ত পুতে ফেলব।

ভয় পায়নি এমন মুখ করে ওরা তিনজন সঞ্জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু মনে মনে ওরা ভয় পায়। সঞ্জয়ের বাবা বড় অফিসার, টেলিফোন তুলে শুধু মুখের একটা কথা বলে দিলে এক্ষুনি কালো গাড়ি এসে পড়বে এবং তিনজনের কেউ ছাড়া পাবে না।

অবশ্য সঞ্জয়ের যে বাবার সঙ্গে সদ্ভাব আছে তা নয়। রাত করে টং মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে, আউট না হওয়া অবধি ড্রিঙ্ক করা সঞ্জয়ের বাবার অভ্যাস। বড় কেম্পানীর পি. আর. ও. মাঝে-মধ্যেই বড় হোটেলে পার্টি এ্যাটেণ্ড করে। সঞ্জয়ের মায়ের ব্যবহারের জন্য আলাদা একটা কার, সঞ্জয়ের একটা স্কুটার, সেও বাবারই পয়সায়। তবু সঞ্জয় আড়ালে বাবাকে শুয়রের বাচ্চা বলে গাল দেয় অবলীলায়। কিন্তু সেই সঞ্জয়ের ওপরেই যদি হামলা হয় তাহলে কী তার বাবা, যতই মদ্যপ হোক, টেলিফোন তুলবে না?

শঙ্কর কিন্তু মনে মনে তাল ঠোকে। সঞ্জয় এতটা বিট্রে করবে এটা তার ধারণা ছিল না প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা তার বাবাও কী খুব কম যায়? কেমিক্যাল প্রডাক্টসের কারখানা তার বাবার। শঙ্করের স্কুটার নয়, একটা মেঘদূত মোটর সাইকেলই আছে নিজস্ব। সঞ্জয়রা কেয়াতলা রোডে ফ্লাট বাড়িতে ভাড়া থাকে আর শঙ্করদের নিজেদের বাড়ী সাদার্ণ এ্যাভেনিউয়ের মোড়ে। শঙ্করের বাবার সঙ্গেও রুই কাতলাদের টেলিফোনে কথা হয়। কিন্তু ইদানীং কারখানায় লক আউট হব হব করছে। ফলে তার বাবার প্রেসার এখন লাফিয়ে লাফিয়ে ওপারে উঠছে। এরকম ঝামেলা না হলে শঙ্করও একহাত দেখে নিত।

তবু সে দুহাতে লম্বা চুল পেছনে ঠেলে দিয়ে সঞ্জয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে—তুই একাই সব খাবি ঠিক করেছিস? তুই কী ভাবিস আমরা পেছনে লাগলে তুই খুব শান্তিতে থাকবি?

সঞ্জয় মুচকি হাসে বলে-আমি একলা খাব কেন, তোরাও খাবি চল, আমি বলে দিচ্ছি, পাত পড়তে শুরু করেছে। চল ফার্ষ্ট ব্যাচেই বসিয়ে দিচ্ছি।

শঙ্করের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। এজন্য নয় যে ভিখিরির মত গিয়ে নেমন্তন্ন ছাড়াই তাদের খেতে যেতে বলছে সঞ্জয়; তার রাগ হয় টাকা পয়সার ব্যাপারটা সঞ্জয় চেপে আছে বলে।

শুভো রেগে গিয়ে বলে—শালা মাল ছাড়বি কিনা বল। নয়তো বাঞ্চৎ আজকে তোকে প্যান্ট জামা খুলে ন্যাংটা করে ছেড়ে দেব।

সঞ্জয় এতেও ক্রুদ্ধ হয় না। বরং আয়াসে একটা ফিল্টার উইলস্ দেশলাইয়ের ওপরে ঠোকে। ফিল্টার সিগারেট এরকম করে ঠোকার কোন প্রয়োজন নেই। তবু ঠোকে সঞ্জয়। নীচের ঠোঁটটা সামান্য এগিয়ে মুখে পোড়ে, তারপর খুব আস্তে করে বলে—বড় তড়পাস না শুভো, এক্ষুনি টুলুদাকে ডেকে আনব বলছি।

—এই শালা, সাবধানে কথা বলবি। বলে জয় দুপা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। শুভো রাগে কাঁপতে থাকে। তার ঠোঁটের কম্পন দেখে মনে হয় সে সাঙ্ঘাতিক কিছু বলবে কিন্তু একটি কথাও সে উচ্চারণ করে না।

টুলুদার প্রসঙ্গটা একটা ধারালো ছুরির চেয়েও জোরালোভাবে তার পিঠে বসে গেছে। কিছুদিন আগে শুভোদের বাড়িতে দুপুর-বেলায় টুলু বাগ হাতেনাতে ধরা পড়ে। ধরেছিল শুভোর বাবাই। দীর্ঘদিন ধরেই টুলু ঠিক দুপুরে শুভোদের বাড়ি যাতায়াত করছিল। শুভোর মা ছাড়া দুপুরবেলায় কারোরই থাকার কথা নয়। থাকেও না। কিন্তু হঠাৎ উড়ো একটা টেলিফোনে কে শুভোর বাবাকে বলে তার বাড়িতে আগুন লেগেছে। শুভোর বাবা এসে আগুন দেখতে পায়নি কিন্তু স্ত্রীকে আর টুলুকে দেখে তার মাথায় আগুন ধরেছিল। ব্যাপার হয়তো কোর্ট কাছারি অবধি গড়াত কিন্তু টুলুই গড়তে দেয়নি তার নাকি একটা সিক্স-চেম্বার আছে। সঞ্জয় অরন্ত-

দেবের মত টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর কায়দা করে ঠোঁট বাঁকিয়ে সিগারেট টানে। লেকের থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রোমান্টিক হাওয়া। আকাশে রসালো ফলের মত একটা চাঁদও ঝুলছে। জয় শুভো আর শঙ্করকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে বলে—চল শালা পরে বোঝাপড়া হবে।

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে সঞ্জয় বলে—পরে টরে কেন রে, এখনই হয়ে যাক না। নাকি তোর দাদা জেল থেকে ছাড়া পেলে দাদাকে দিয়ে আমাকে পেটাবি?

জয় বলে—তোকে পেটাতে দাদার দরকার হবে না রে, ইচ্ছা করলে আমি একলাই পারি। –তা ইচ্ছাটা কর না। সঞ্জয় শব্দ করে হাসে।

শঙ্কর বলে—চল চল। বলে শঙ্কর এগিয়ে যায়।

জয়ের দাদা ব্যাঙ্ক ডাকাতির দায়ে ধরা পড়ে জেলে আছে ছমাস। ফলে জয়ও দাঁড়ায় না।

ওরা সদার্ণ এ্যাভেনিউর মোড় থেকে কেয়াতলা রোড ধরে এগোতে থাকে।

সামনেই বাঁদিকে দীপান্বিতা হল। দুটো গেটেই বড় বড় দুটো প্রজাপতি। মাইকে আলি হোসেনের শানাই। ডাইবিনের সঙ্গফেলা কলাপাতা মাটির ভাড় আর উচ্ছিষ্ট নিয়ে ভিখিরি আর কুকুরে মারা-মারি। ফ্রায়েড রাইস আর মাংসের গন্ধে বাতাস টাল খাচ্ছে। হঠাৎ শঙ্কর বলে ওঠে—সাঙ্ঘাতিক খিদে পেয়েছে মাইরি।

জয় বলে—চল শালা ঢুকে পড়ি।

শুভো বলে—দুশ শালা ভিখিরি নাকি?

—যা বাবা এতে ভিখিরির কী হল? হাজার হাজার টাকা খরচা করে বৌভাত আর বিয়ে হচ্ছে, হাজার লোক খাচ্ছে। আমরা কী শালা জলে ভেসে এসেছি নাকি! বলে শঙ্কর ঠেলে দেয় শুভোকে।

জয় বলে—চল বাবা। সঞ্জয় শালা তো মালকড়ি ছাড়বে না, খেয়ে উসুল করে নিই।

টেরিলিনের পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি আর বাটার চপ্পল। বর।

অতিথি অভ্যাগত আপ্যায়নে ব্যস্ত। শঙ্কর গিয়ে বলে দাদা, একটা কথা আছে। কাইণ্ডলি যদি—

কী কথা! বরের চোখে বিস্ময় ভয় কিম্বা ভদ্রতার খুশিয়ালি উজ্জলতা।

—একটু প্রাইভেট, যদি একটু এদিকে আসেন।

—চলুন।

গুজ গুজ ফিস ফিস কিম্বা টানা পোড়ন চলে তিনমিনিট।

চতুর্থ মিনিট থেকে দশম মিনিটের মধ্যেই শঙ্কর জয় এবং শুভো পর পর পাশাপাশি বসে যায়। কিছুদূরে কোনের দিকে তারা সঞ্জয়কেও দেখতে পায়। তখন সঞ্জয়ের পাতে ফিস ফ্রাই পড়ছে। আর ওদের তিনজনের পাতে ক্রায়েড রাইস। লেকের থেকে হাওয়া বয়। রোমান্টিক হাওয়া। রসালো ফলের মতো আকাশে চাঁদ ঝুলে থাকে। মাইকে আলিহোসেনের শানাই। আর চারটে কুকুরে একটা মাংসের হাড়ের দখলের জন্য সবকটা দাঁত বের করে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। আকাশের রসালো ফলের মত চাঁদ মুখ নীচু করে পৃথিবীর দিকে তাকায়। পৃথিবীতে চাঁদের আলোয় কুকুর গিজগিজ করে।

———

Phone : 23-8466

With best compliments from :

Present OPTICAL CO.

WHOLE SALE & RETAIL OPTICIAN

20/1C, Bipin Behari Ganguly Street
Calcutta-700012

N. B. AT NO EXTRA COST EYES ARE TESTED BY QUALIFIED OCULIST.

গল্প

শ্যামল অনুরাগে

রবীন্দ্র গুহ

লতিকা সব কথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হল! অনাত্মীয় পরপড়শী হলেও না হয় বোঝা যেত, কিন্তু ঘরের বউ দুঃখে-শোকে ঘর ছাড়ল, কোথায় গেল, বেঁচে রইল কি মরে গেল, তার একটা খোঁজ পর্যন্ত নিতে নেই! মানুষটা কি!

না, মানুষটা মানুষ না, উদার মহৎ না, প্রাণপদ্মে মূর্ত না।

লতিকার চোখমুখ রাগে উত্তেজনায় রক্তময় হয়ে উঠল। কপালের ঘন নিবিড় কুঞ্চনে স্পষ্ট ঘৃণা আর অবজ্ঞার ছাপ। ছি ছি, এমন লোকের বেঁচে থাকাই কলঙ্ক। জীবনের সঙ্গে সদাসর্বদা ভয়ংকর চারচুপি করে এরা। কাম্যবস্তুটি করায়ও করার সকল ফন্দি-ফিকির জানা এদের। তারপর কাজ ফুরলেই করমুক্ত, ঘরমুক্ত। ওই যে কথায় আছে না সুখের সময় যত শান্ত-মহান্ত, সুখ ফুরলেই শর্ত ভঙ্গ।

লতিকা দাঁতে দাঁত ঘষল। রাগে অপমানে কাঁপতে থাকল। তাছাড়া মানুষ তো দূরের কথা, জন্তু-জানোয়ার, কীটপতঙ্গ, এমন কি সামান্য একটা প্রাণহীন কলের পুতুল থাকলেও তার জন্য কত দরদ মানুষের। একটা পোষা পাখি হারিয়ে গেলে, মানুষের কত দরদ-ভরা কান্না শুনি, শোকে দুঃখে বুদ্ধিভ্রংশের মত আচার আচরণ করতে দেখি!

লতিকার মনে পড়ল, সেবার মুপু কাকিমার আদরের কুকুরটা বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেল। মুপু কাকা তক্ষুনি পুলিশে খবর

দিলেন। হ্যাণ্ডবিল ছেপে পাড়ায় পাড়ায় বিলি করলেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, হারানো প্রাপ্তি বিভাগে নুপু কাকিমার কুকুরের ছবি ছাপা হল। নুপু কাকিমা এমন হাসিখুসি মহিলা তবু কুকুটির দুঃখে কেঁদে ফেল্লেন।

কিন্তু তবু, কুকুর ত' একটা জন্তু মাত্র, কুকুর একটা হারালে আর একটা জোগাড় করা যায়। লতিকার মনে আছে, সবাই এই ভাবেই বুঝিয়ে ছিলেন নুপু কাকা আর কাকিমাকে। অনেক ভেবে চিন্তে নুপু কাকা শান্ত হয়েছিলেন। এইসব দেখে শুনে লতিকা বুঝেছিল, সামান্য একটা কুকুরের জন্যই যখন এত, নুপু কাকিমার কিছু হলে নুপু কাকাকে কোন ক্রমেই বাঁচানো যাবে না।

এমন না হলে মানুষ! ওই যে গল্পে আছে না, দয়াময় ঈশ্বর আদিতে পৃথিবীর প্রথম মানুষটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বলো তুমি কে?'

সে বলল—'আমি মানুষ।'

'তুমি মানুষ তার প্রমাণ কি?'

সে চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিতে পারল না। দয়াময় আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'বলো, তুমি মানুষ তার প্রমাণ কি?'

সে বলল—'আমি দু'পায়ে ভর করে হাঁটতে পারি, দৌড়াতে পারি।'

'সে তো পশুরাও পারে।'

'আমি নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করতে পারি, ঝড়জল থেকে নিজেকে বাঁচতে পারি, লড়াই করতে পারি।'

'আর?' এতে ঈশ্বর উত্তেজিত।

'আমি দুঃখ বেদনায় কষ্ট পাই, মৃত্যুকে এড়িয়ে চলি।'

ঈশ্বর এবার মহাখুশি—'সাবাশ। অর্থাৎ তোমার হুঁশ আছে। যেহেতু তোমার হুঁশ আছে তাই তুমি মানুষ।'

কিন্তু কোথায় আজ ঈশ্বরের প্রথম হুঁশিয়ার মানুষের বংশধরেরা? এই অমলেন্দু কি? লতিকার ঠোঁটে রাজ্যের বিতৃষ্ণা দৃঢ় নিবদ্ধ হল। রুক্ষ কঠিন হল চোখের দৃষ্টি।

ঘরের কোনের মোটা হাতলঅলা চেয়ারটায় বিষদাচ্ছন্ন মুখ

করে বসেছিল অমলেন্দু। মেরুদণ্ডটা ঈষৎ নামানো, লম্বাটে চেয়াল, হাতের কব্জি খুব মোটাও না, সরুও না। মধ্যবিত্ত বাঙালী ছেলেদের মত সমস্যাজর্জরিত, সদাচিন্তিত, বিমর্ষ। কিন্তু ললিতার মনে হল, আসলে ওসব কিছুই নয়, সব ভান, চতুর ভঙ্গিমায় প্রাণ ভোলাতে চায়। যেমন দুষ্টু পাখিরা করে। বনের বাঁদররা করে। অমলেন্দু এখন একটা মূর্খ বাঁদরেরও অধম। লতিকার বিশ্বাস, ভঙ্গিটা অমলেন্দুর প্রকৃতিগত নয়, ভঙ্গিটা নকল। নিজে মরিয়া হয়েও অন্যকে মুগ্ধ করতে চায়। এজন্য রাগও হল লতিকার। মনটা বিষিয়েই ছিল, এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

'লজ্জা পাবেন না, বলুন সব কথা খুলে বলুন—'

অমলেন্দু মিনমিন করে উত্তর দিল—'বলেছি তো, আমাদের ঝগড়া হয়নি, সামান্য কথা কাটাকাটিও না, তবু—'

'কিছু নিশ্চয়ই হয়েছিল, যার জন্য ও ঘর ছাড়তে বাধ্য হল।'

অমলেন্দু চুপ। লতিকা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

'কই, বলুন।'

অমলেন্দু হাত দুখানা কোলের মধ্যে জড়ো করে নেয়, বলে—'আমি যা কিছু বলছি সব সত্যি।'

'তার কোন প্রমাণ নেই।' ব্যঙ্গ করে বলে লতিকা, কথায় করে এবং ভঙ্গিতেও করে।

'আমার কিন্তু মনে হয় আপনি নিশ্চয়ই'—বলতে বলতে থামে লতিকা। বাকিটা কি ভাবে বলা উচিত ভাবে। অমলেন্দুর চোখের দিকে তাকায়। তা ভাবলেশহীন। মুখখানা ভুতো পেঁচা বা একটা ডিমের মত। যত টুকু দ্বিধা ছিল, তাও উবে গেল মন থেকে। নির্মমভাবে বলে ফেলল কথাটা—'আমার মনে হয়, আপনি ওকে নির্যাতন করতেন, ওর ওপর—'

'না।'

বাঁদরটা বদন তুলল। বিকট একটা শব্দ করল। লতিকা কিন্তু ভয় পেল না। বরং আরো শক্ত হল, কঠিন কঠোর কথা বলার পরিস্থিতি খুঁজে পেল।

'অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন আপনি। আমার ধারনা মিথ্যা প্রমাণ

করতে পারেন? একটা মানুষ, শান্তিপ্রিয় সংসারপ্রেমী মানুষ, ভয়ানক কোন কারণ না ঘটলে সে কেন নিজের সংসার, প্রিয়পরিজন ত্যাগ করে চলে যাবে?'

'সেইটাই তো আশ্চর্যের!'

'আর অমন আশ্চর্যের বিষয়টা নির্বিবাদে সহ্য করে গেলেন।'

'আমার যথাসাধ্য করেছি।'

'কিছুই করেন নি।' লতিকা পূর্ববৎ দৃঢ়তায় একনিষ্ঠ হল। দৃষ্টিতে যথেষ্ট সন্দেহের ভাব নিয়ে ফের বলল—'জিতুদের বাড়িতে খবর নিয়েছেন?'

'নিয়েছি।'

'আর কোথায়?'

'আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।'

'আমি সে টেলিগ্রাম পাইনি।' লতিকার কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর। অমলেন্দুর দুষ্টু জারিজুরি ধরতে একবিন্দু অসুবিধা হয় না তার, এমনি ভাব করে।

অমলেন্দু বলল—'টেলিগ্রাম পৌঁছুবার আগেই আপনি এসে পড়েছেন।'

বক্র ঠোঁটে হাসে লতিকা—'আমি এসে অসুবিধা করেছি বুঝি?'

সে কথার কোন উত্তর দিল না অমলেন্দু। সে মাথা নিচু করে ফুলহাতা গেঞ্জি বর্ডার থেকে ঢিলে হয়ে যাওয়া একটা সুতো ছিঁড় ছিল।

লতিকা বলল—'হলেও কোন উপায় নেই। তাছাড়া আমি বিনা নিমন্ত্রনে তো আসিনি। আপনারাই চিঠি লিখে লিখে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। নতুবা আমার চাকরিটি একটু বিপদের, সহজে ছুটিছাটা পাওয়া যায় না, আবার ছুটি পেলেও সব সময় সবার কাছে আসার মন থাকে না। আপনাদের সবগুলি চিঠিই আছে আমার কাছে, উঃ, কি সব ভাষা—চলে আয় দু'দশ দিনের জন্য, আমরা মধুময় স্বপ্নের মঞ্জিল তুলেছি। প্রাণ খুলে বেড়াচ্ছি জানিস, উড়ছি, ঘুরছি, অথচ ফুরোচ্ছি না, বুড়োচ্ছিও না। দেখতে দেখতে তিনটে বছর তো কেটে গেল, কিন্তু এখনো নাক তুললেই বাসর রাতের

কস্তুর গন্ধ পাই।'

লতিকা হাসল। কস্তুর না ছাই! একখানা নতুন বস্তাপেড়ে শাড়ির গন্ধও যদি পেতাম! চলে গেছে তো মাত্র দুদিন, বাড়িঘর দেখে মনে হচ্ছে ছ'মাস থেকে ঝাড়পোচ পড়েনি।

'শেষের দিকে ও অসুস্থ ছিল'—অমলেন্দুর গলার স্বরে বেদনার বেশ।

লতিকা আবার তীর ছুঁড়ল—,আর তা সত্বেও আপনি ওকে নির্যাতন করতেন!'

'আঃ, আপনি থামুন!' অমলেন্দু ফের ফোঁস করে ওঠে। হাত দু'খানা ছিটকে সরে যায় কোলের ওপর থেকে। মেরুদণ্ড সোজা হয়। ভাবখানা এমন, যেন এক্ষুনি চলে যাবে অন্য ঘরে। শাদা দেয়ালের দিকে চোখ রেখে বলে—'আপনি যা জানেন না, তা নিয়ে,—

'কথা বলব না, এই তো? বেশ, বলব না।' লতিকার আহত কণ্ঠে ক্ষুব্ধতা।

অনেক্ষণ চুপচাপ।

শেষে আবার বলে—'আপনি কি বা কেমন মানুষ তা আমার জানার দরকার নেই। মিতুকে নিয়ে কি সব কাণ্ড করছেন তাও শুনতে চাই না। কিন্তু তাই বলে আমি আপনাকে এভাবে হাত পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেও থাকতে দেবো না। মিতুকে খুঁজে বার করতে হবে। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, আপনি সৎ মহৎ, মিতুকে আপনি ফিরে পেতে চান, আপনার জীবনে তার প্রয়োজন আছে।'

'বলেছি তো, আমি সে চেষ্টা করছি।' অমলেন্দু তার সততা জাহির করতে চাইল। কণ্ঠস্বর যেহেতু খুবই নিরস নিস্তেজ, দৃঢ়তা তত স্পষ্ট হয়ে ফুটল না। তবু ভাল লাগল লতিকার। লোকটা যেন সত্য কথাই বলছে। তাই একটু নরম হয়ে বলল—'যা করেছেন তার হিসাব নিয়ে লাভ নেই। আরো শক্ত হতে হবে, পরিশ্রমী হতে হবে। শুনুন, কাগজে ওর ছবিসহ বিজ্ঞাপন দিন, পুলিশের সাহায্য নিন,—'লতিকা দম নিতে নিতে বলল কথা

কয়টি। তাকাল অমলেন্দুর দিকে। তার চোখমুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করল, চিন্তাসূত্রগুলি ছুঁতে চেষ্টা করল। এবং শেষে ফের বলল—'আমি আপনাকে সাহায্য করব। যত দিন না মিতু ফিরে আসে ততদিন আমি থাকব এখানে। যেখানে যেখানে যাওয়া দরকার একসঙ্গে যাবো। মিতু আমার বন্ধু, ওর জন্য আমি সব কিছু করতে রাজি।'

এবার যেন অন্তহীন সমুদ্রে একটা জাহাজ দেখল অমলেন্দু। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখখানা। বিষণ্ণ রিক্ত অসহায়তার অভিব্যক্তি অপসারিত হল। সে বলল—'আজই তাহলে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দি।'

লতিকা বলল—'হ্যাঁ, আজই। আর ভালো কথা, আপনাদের আত্মীয়স্বজনদেরও একটা লিষ্ট করতে হবে।'

তাই হল, লতিকা যেমন যেমন বলল, ঠিক তেমন তেমন করল অমলেন্দু। শুধু বন্দোবস্ত নয়, হন্নে হয়ে ছোটাছুটি করল এদিক ওদিক। শ্রীরামপুরে মিতুর ছোটমাসি থাকেন, একদিন দু'জনে ঘুরে এলো সেখান থেকে। বারাসতে থাকেন জ্যাঠতুতো দাদা, সেখানেও গেল একদিন। তারা ঘটনা শুনে অবাক হল। বাঁকা দৃষ্টিতে লতিকার দিকে তাকাল। কটাক্ষ করে দু'চারটে মন্তব্যও করল। তাদের ব্যবহারে লতিকা মর্মাহত হল। ফেরার পথে সে দারুণ চুপচাপ হয়ে রইল। অমলেন্দু মাঝে মাঝেই খুব স্বাভাবিক হতে চাইছিল।

পরদিন একটা খবর এলো সংবাদ পত্রের আপিস থেকে। ছুটল ওরা। কিন্তু না, খবরটা মিলল না, তারা যে ছবিটা দেখল তার সঙ্গে মিতুর কোন মিল নেই।

বাড়ি ফেরার পথে লতিকা বলল—'আপনি বরং আর একবার যান মিতুদের বাড়ি।'

অমলেন্দু অসম্মতি জানাল। বলল—'ওর বাবা আমাকে পছন্দ করে না। তাছাড়া ওরা সবাই আসানসোলে গিয়েছে। সেখানে মিতুর বড়মামা খুব অসুস্থ। মিতু তাকে খুব ভালবাসত। এসময় তার কাছে নিয়ে যেতে পারলে তিনি খুব খুশি হতেন।'

লতিকা চুপ করে। ওকে ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। চোখের কোণে ঈষৎ কালির চিহ্ন। দৃষ্টি নিঃস্ব ছায়াছায়া।

অমলেন্দু ওকে খুশি করার জন্য একটা রেস্তোরায় ঢুকল। লতিকা চেয়ারে বসে কাঁচ ঢাকা টেবিলের দিকে তাকাল। কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের তেলোয় থুতনি রাখল। লতিকার হাতের অঙ্গুলগুলি বেশ লম্বা এবং সরু, সুন্দর ঝকঝকে নোখ। গালের চারপাশে আঙ্গুলগুলি এমন ভাবে ছড়িয়ে যেন মনে হয় একটি ফুটন্ত মৃণাল।

অমলেন্দু লতিকার মুখের রঙ রেখার অপ্রকাশ্য ছায়া খুঁজল, নিরাশ হল। রক্তিম অধরের তলে লজ্জা আর বাসনার প্রতিবিম্ব খুঁজল, নিরাশ হল। অমলেন্দু এখন কি করবে? কি বলবে? এভাবে চুপ করে থাকা অশোভন। বিশেষ কোন জনারণ্যে, পার্কে, রেস্তোরায়, পেভ্‌মেণ্টে দাঁড়িয়ে কোন তরুণীর মুখোমুখি এভাবে নিঃশব্দ হলে থাকলে সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে। অমলেন্দুর কি অধিকার আছে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকার? লতিকার কপালের উপর দুটো ঝুড়ো চুল ওড়াউড়ি করছিল। অমলেন্দুর মনে একটা বেআইনি ইচ্ছা উঁকি দেয়, চুল দুগাছি সিঁথির দু'পাশে সরিয়ে দিলে কেমন হয়, কিন্তু অমলেন্দুর সে অধিকার নেই।

বেয়ারা এসে টেবিলের ওপর খাবার রেখে যায়। দুটো করে টোষ্ট আর ওমলেট। লতিকা হাতের তেলো থেকে মুখ সরিয়ে নিল। পদ্মের মত ভঙ্গিটা ভেঙ্গে গেল।

'আজ আর বাড়ি গিয়ে কিছু খাবো না।'

'তাহলে বরং আপনি আরও কিছু নিন।'

'শুধু আমি!'

লতিকা লজ্জা পেল। অকারণ। অমলেন্দুর ভালোই লাগল। সে আনন্দে জোরে জোরে কামড় দিয়ে ওমলেট চিবোতে লাগল। একটু আগের বিষাদ শূন্যতা, ক্লান্তির নেশামাত্র নেই চোখেমুখে।

পথে বেরিয়ে অমলেন্দু বলল—'চলুন, আজ আমরা হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরব।'

লতিকা চুপ। সামান্য হাসল শুধু।

'অনেক দূর কিন্তু, পারবেন তো হাঁটতে?'

তবু লতিকা চুপ।

'ঠিক আছে, যতদূর পারা যায় হেঁটেই যাওয়া যাক। তারপর না হোক ট্রামে ওঠা যাবে, কেমন?' অমলেন্দু এমনভাবে কথা বলছিল যেন ওর মতামতই যথেষ্ট। যেন লতিকা কিছুই নয়, লতিকা এমন একজন যে ওর চিরকালের করতলগত।

হৃদয়গত নয়?

লতিকা লক্ষি মেয়ের মত ঘাড় কাত করল। ঠিক যেমন নতুন বিবাহিত মেয়েরা স্বামীর প্রতিকথায় সায় দেয়।

ফুটপাথে অসংখ্য লোকের ভিড়। কতরকম ভাবে হাঁটছে সবাই। আগেপিছে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটছে কেউ, খুব দ্রুত পা ফেলে ফেলে চলেছে। লতিকার মনে হল তারা খেলার মাঠ থেকে ফিরছে। আর একজন, তিনি একা, হেলাফেলা পায়ের গতি। ভিড় দেখতে বেশ লাগে লতিকার। এসময় অমলেন্দু খুব প্রাণময়। মুখে যেন খই ফুটছে। সে বলছিল—'ছেলেবেলায়, জানেন, আমি এই পথে কলেজে যেতাম। দারুণ বোকার মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটতাম। চিনে বাদাম খুব প্রিয় ছিল আমার। এখনো পার্কে ঢুকলে আমি চিনাবাদাম কিনি। আর জানেন, ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশ দেখতেও আমার খুব ভালো লাগে। আকাশটাকে একটা মস্ত সার্কাসের তাঁবু মনে হয়। কি অদ্ভুত দেখুন, কোন মাথামুণ্ডু নেই। ওকি আপনি হাসছেন? পাগল ভাবছেন বুঝি? না, পাগল নই, আকাশটাকে তাহলে সমুদ্র মনে হত। কি, ঠিক কিনা বলুন না?'

'বারে, আমি কি করে বলব, আমি কি পাগল নাকি?'

দু'জনে হেসে ওঠে।

'আপনি খুব ছেলেমানুষ'—

'হ্যাঁ, মিতুও তাই বলত, আমি নাকি খুব ছেলেমানুষ!'

ক্রমশ ভিড় কমে আসে। এদিকটায় ফাঁকা। চৌরাস্তার মোড়ে একজন লোক ফুল বিক্রি করছিল। অমলেন্দু থমকে দাঁড়াল—'ফুল নেবেন?'

কথাটা বলেই অমলেন্দুর খটকা লাগল। তাড়াতাড়ি অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে চাইল—'আসুন, কিছু ফুল নেয়া যাক।' কিন্তু তার

অবসর পেল না, লতিকা বলল, 'হ্যাঁ, চলুন, রজনীগন্ধা আমার খুব পছন্দ।'

অমলেন্দু খুশি হল। মনে মনে ফুলের শরীরে হাত রেখে সে তার মনকে ছুঁয়েছে।

পরদিন একটা চিঠি এলো আসানসোল থেকে। আসানসোলে তো মিতুর বড়মামা থাকেন। অমলেন্দু তখন বাড়ি ছিল না। চিঠিটা হাতে নিয়ে বুকটা কেঁপে ওঠল লতিকার। যেন একটা সাপ ধরেছে হাতের মুঠোয়। তবে, সাপটা যতই হিংস্র হোক, সে ইচ্ছা করলেই টিপে মারতে পারে।

অমলেন্দু বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকল, স্নান করল, হাতেমুখে খাওয়ার পর্ব সারল, তারপর ছুটল আপিসে। এত তাড়া-হুড়োর মধ্যেও লতিকা চিঠির কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল তা নয়। প্রতিমুহূর্তে মনে পড়ছিল। অথচ লতিকা অমলেন্দুকে বলতে পারছিল না। কেন?

আয়নার সামনে তাকের ওপর ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজানো ছিল। জামার বোতাম আটকাতে আটকাতে এক ফাঁকে অমলেন্দু রজনীগন্ধার একটা বোঁটা ছিঁড়ল। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধশুঁকল। তারপর বোঁটাটা নিয়ে তাকের ওপর রাখল। লতিকা তাকিয়ে তাকিয়ে এইসব দেখল। তখন চিঠিটার কথা বলতে পারত। বললে অমলেন্দু কি করত?

অমলেন্দু বেরিয়ে যেতেই লতিকা আবার চিঠিটা নিয়ে বসল। উল্টেপাল্টে দেখল। জোরে একটা চাপ দিল, বেঁকে গেল খামটা। তারপর খুব তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল একটা পাশ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়তে লাগল। যতক্ষন পড়ছিল আঙুলগুলি থরথর করে কাঁপ-ছিল। পড়া শেষ হতেই সব নিথর।

অসম্ভব ক্লান্তি নিয়ে লতিকা উঠল। বাথরুমে গিয়ে স্নান করল। সাজপোষাক বদলাল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর করে চুল বাঁধল। এইসব করতে করতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল অমলেন্দুর ফেলে রেখে যাওয়া রজনীগন্ধার বাসি বোঁটাটা। লতিকা সেটা তুলে নিল, সযত্নে খোঁপায় গুঁজে আয়নার দিকে ফিরল।

বিকেলবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে অমলেন্দু অবাক হয়ে দেখল শুন্য বাড়ি, আয়নার সামনে তাকের ওপর যেখানে ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজানো ছিল, তা নেই। পরিবর্তে অনতিদূরে যত্ন করে রাখা আছে মিতুর লেখা চিঠিটা।

গল্প

তুমি আছো আমি আছি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এসপ্লানেড পৌঁছতে বেশী সময় লাগল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এই নন্দিনী, মিনি বাসের পেছনের সিট থেকে কে যেন ডাকল, নন্দা দাঁড়াও। চমকে উঠল নন্দিনী, রজনী কাকা! তিনি যে একই গাড়িতে ছিলেন, লক্ষ্যই করেনি ও। রজনী ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নেমে এলেন।

মা বলতেন, রজনী ঠাকুরপো, সেই সুবাদে নন্দিনীর কাকা। বাবার ভাই টাই কিছু নয়। কী করে যেন ওদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়েছিলেন। নন্দিনীর মনে আছে ও যখন খুব ছোট তখন রজনী কাকা আসতেন ওদের বাড়ীতে। একটু বড় হয়ে ওর কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল বাবা রজনী কাকাকে খুব পছন্দ করেন না। এই নিয়ে বাবা মার মধ্যে চাপা একটা মন কষাকষিও ছিল। রজনী কাকা যে ওদের সংসারের জন্য কত করেছেন তা, নন্দিনী নিজেই দেখেছে, কিন্তু কেন করতেন বুঝতে পারে না ও। রোজ দুবেলা যেতেন, কার কী দরকার না দরকার জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। মা চিরকালই রুগ্ন, তার শিয়রের কাছে একটা টুল নিয়ে বসতেন রজনী কাকা। ওঁকে দেখলেই মায়ের অসুখ অনেকখানি কমে যেত।

মারা যাবার আগে নন্দিনীর বাবা একদিন রাগে ফেটে পড়েছিলেন। বাড়ি ফিরে যেই দেখলেন রজনী তাঁর স্ত্রীকে কাঁধে হাত দিয়ে সযত্নে খাট থেকে নামাচ্ছেন, আগুন জ্বলে গেল মাথায়। যাচ্ছেতাই অপমান করে রজনীকাকাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে

দিলেন বাবা।

সেই থেকে যতদিন বাবা বেঁচেছিলেন রজনীকাকা নন্দিনীদের বাড়িতে আসেনি। তবু যখনই নন্দিনী গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাহায্য করেছেন, একটি মাত্র প্রশ্ন করেছেন, তোর মা কেমন আছে রে? মা বলতেন, রজনী ঠাকুরপোকে একবার আসতে বলিস।

নন্দিনী কোনদিন সেকথা বলেনি।

মিনিবাস থেকে নেমে রজনীকাকা নন্দিনীর একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। উল্টো দিকে মেট্রো। লবিতে অমলের দাঁড়িয়ে থাকার কথা।

—তোকে দেখে নেমে পড়লাম। মুখে একটা কৌতুকের ভঙ্গি করে রজনী বললেন, একা, না আর কেউ আছে?

নন্দিনী ঢোক গিলে বলল, একা—

—চল্ টিকিট কেটে দি।

—এ্যাডভান্স কাটা আছে।

নন্দিনীর পা যেন চলে না, ওর আড়ষ্ট ভয় ভয় ভাবটা উপভোগ করলেন রজনী। নন্দিনীকে আগলে নিয়ে রাস্তা পেরুলেন। লবিতে এসে ভিড়ের মধ্যে চোখ বুলিয়ে অমলকে ইশারায় ডাকলেন। বললেন, নন্দা আমাকে বলল একা এসেছে; একালের মেয়ে একা সিনেমা দেখছে, একজন উপযুক্ত সঙ্গীও জোটাতে পারেনি এ যদি সত্যি হয়, তাহলে তো এর কোন ফিউচার নেই। একটু থেমে আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ক্লাস কেটেছ?

অমল বলল, টিকিট কাটিনি তো?

রজনী বললেন, নন্দা, তা হলে তোর কাটার কথা ছিল?

মুখ নিচু করল নন্দিনী। রজনী দেরী না করে বুকিং কাউন্টারে গিয়ে দুটো টিকিট কেটে আনলেন। অমলের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, এই নাও, ফার্স্ট বেল পড়ে গেছে। ঢুকে পড়।

অমল ও নন্দিনী দেখল দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে গেলেন রজনী কাকা।

• • •

রজনী গাঙ্গুলি বড় ঘরের ছেলে, কলকাতায় নিজের একটা এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি আছে। যৌবনে অনেক খেটেখুটে সেটা দাঁড় করিয়েছিলেন। এখন তা থেকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা আয় হয়।

ঐ এজেন্সি যখন সবে অফিস খুলেছে তখন টাইপিষ্ট হয়ে এল একটা মেয়ে—নাম বাসন্তী দাশ। ছোট অফিস, ষ্টাফ বলতে জনা তিনেক, বাসন্তী এটা ওটা সই করাতে আসত ডাইরেক্টর রজনী গাঙ্গুলির ঘরে। বাসন্তীকে ভাল লেগেছিল রজনীর; বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু তখনও বিয়ের ব্যাপারে ছেলে মেয়েদের এতটা স্বাধীনতা আসেনি, অভিভাবকদের মতামত জরুরী ছিল। বাসন্তীর বাবা অসবর্ণ বিবাহে রাজী হলেন না, রজনীর বাবা মাও বললেন, সামান্য একটা টাইপিষ্ট গার্লকে বিয়ে করলে তোমার বিজনেসের ক্ষতি হ'বে।

বাসন্তী চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, রজনী বিয়ে থা করেন নি। এখন বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে।

কার জীবনে যে কী চমক অপেক্ষা করে আছে কে বলতে পারে। মহাদেব ঘোষ একটা ছাপাখানায় কাজ করত। বিজ্ঞাপনের কপি নিতে বা প্রুফ দেখাতে আসত, সেই সূত্রে আলাপ। একদিন রজনীকে হঠাৎ বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসল মহাদেব ঘোষ।

বাড়িতে ঢুকেই মহাদেব ডাকল তার স্ত্রীকে, আঁচলে মুখটা মুছে বাইরের ঘরে এল একটি সুশ্রী কিন্তু রুগ্না মহিলা। দেখেই চমকে উঠলেন রজনী, একি বাসন্তী!

সেই থেকেই এই পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন রজনী গাঙ্গুলী। মহাদেব মারা যাবার আগে থেকেই গোটা সংসারটা তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। নিষ্ঠুর দারিদ্র্য আর ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাসন্তী বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদত, রজনী বলতেন, আমি তো আছি।

* * *

সিনেমা থেকে বেরিয়ে অমল আর নন্দিনী দেখল তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, সহসা থামবে বলে মনে হয় না। নন্দিনী বলল, বাড়িতে বরং একটা ফোন করে দিই, মাকে।

বুকিং থেকে বাড়ির নম্বর ডায়াল করল নন্দিনী, ধরলেন রজনী

কাকা। এত রাত্তিরে মায়ের ঘরে রজনী কাকা, বিচ্ছিরি লাগল নন্দিনীর।

অমল বলল,—তোমার রজনীকাকা, না? লোকটা রিয়ালি দারুণ। বিয়ে করল না, কিন্তু—

নন্দিনী বলল, কিন্তু কী?

অনেক কিছু বলতে পারত অমল, নন্দিনীও উত্তর দেবার জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু দুজনেই চুপ করে রইল।

মহাদেব মারা যাবার পর পুরনো বাড়িতেই ছিল নন্দিনীরা। টানাটানি পড়লেই বাসন্তী বলেছে, একবার রজনী ঠাকুরপোর কাছে যা তারপর তিনিই ওদের নতুন ফ্ল্যাটে এনে তুললেন। বাসন্তী তখন পুরোপুরি শয্যা নিয়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধে হবে বলে টেলিফোন নিলেন। রোজ দুবেলা এসে মায়ের মাথার কাছটিতে বসে থাকতেন। কী যে চায় মায়ের কাছে রজনী কাকা!

আজ স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ নন্দিনীর মনে হল রজনীকাকা কিছু চাওয়ার চেয়ে বিলিয়ে বেশি আনন্দ পেতেন। শুধু টাকা পয়সা নয়, নিজেকেও তিনি তিল তিল করে বিলিয়েছেন। এই যে মেট্রোয় দুজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন এও বোধ হয় যৌবনের না পাওয়া আকাংক্ষার বিকল্প তৃপ্তি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অমল বলল, চল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল্লাগে না। এক জায়গায় কতক্ষণ দাঁড়ানো যায়।

নন্দিনীর মুখে কেমন একটা ব্যঙ্গের হাসি যেন ঝিলিক দিয়ে গেল। ভাবল, রজনী কাকা কিন্তু সারা জীবন এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছেন।

Phone : 34-5714.

With the best compliments from :

K. M. Khadim

150B, Lower Chitpur Road
(Rabindra Sarani)
Calcutta-700001.

গল্প

কৃষ্ণচূড়ার রঙ

জয়া রায়

লম্বা প্লাটফর্মটা পার হ'তে হল না, তার আগে মাত্র তিন পা এগিয়েই দেখলাম একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় পিয়া বৌদির মুখ হাসছে। সারা রাত জেগে জেগে পিয়া বৌদি ঈষৎ বিবর্ণ এবং পাণ্ডুর। দিন শেষে ঝরাফুলের মতো। আমায় দেখে ধূসর রঙের শালের ঘোমটায় সারা মুখ ঘিরে নেমে এল ট্রেণ থেকে। কালো চোখের তারায় ভোর রাতের মিলিয়ে যাওয়া তারার রঙ। হাসল পিয়া বৌদি—কেমন আছো টুটুল?

এই চলমান সমুদ্র, ছুটন্ত জীবনস্রোত, ঘুরে যাওয়া পৃথিবী, ভোরের ছায়ায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন, এই সবের মাঝে দাঁড়িয়ে আবার প্রশ্ন করল পিয়া বৌদি—কেমন আছো টুটুল?

হাসলাম আমি—ভালো।

—সব খবর ভালো তো?

—ভালো।

আমার হাতে পিয়া বৌদির সুটকেশ, অর্থাৎ পিয়া বৌদির প্রয়োজন। প্রবহমান জনতার পাশ কাটিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এলাম। বাইরে সকালের বাল্য রোদ। ভিজে চত্বর। দূরে গাছের ডালে অবাধ্য চড়ুই। সার দেওয়া গাড়ী। ট্যাক্সির প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে এক লম্বা লাইন। ছায়াময় চোখের দৃষ্টি চারদিকে বিছিয়ে দিল পিয়াবৌদি, —অনেক বদলে গেছে টুটুল।

—তাই বুঝি?

—হুঁ। তারপর ঈষৎ হেসে বলল—বদলাবে না। কতবছর হয়ে গেল। সবই বদলায়।

পিয়াবৌদি খুব সুন্দর এবং সঠিক কথা বলে। শুধু এই মুহূর্তে নয়, চিরকাল। আমার বলতে ইচ্ছে করছিল—হ্যাঁ বৌদি, বদলায়। প্রয়োজনেই বদলায়। একঘেয়েমি আর কতদিন ভালো লাগে? এই যে তুমি, সুন্দর তুমি, ঝরে যাওয়ার আগে শুকনো কৃষ্ণচূড়ার মত শেষ যৌবন নিয়ে তুমি, এই বিরাট শহরের প্রবেশ চত্বরে দাঁড়িয়ে আছো, এই তুমিও যে কত বদলেছ। মুখে বললাম—এবার ট্যাক্সির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে। পিয়াবৌদি কিছু বলল না। আমার পেছনে পেছনে লাইনে এসে দাঁড়াল। নিষেধ করলাম, উল্টে হাসল, বলল—তোমার পাশে দাঁড়াই না একটু।

* * *

সেই আটবছর আগে, পিয়াবৌদি তখন একটু বেশী কথা বলত, যদিও কথাগুলো খুব সুন্দর ও সহজ ছিল। সব সময় হাসতো। ঢলঢলে একটি সদ্য ফোটা ফুলের মত এই সংসারে ব্যস্তে ফুটে থাকত। আমি এই ফুলকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম।

সেদিন লেকের জলে প্রচণ্ড স্রোত। গাছ ভরা রঙীন কৃষ্ণচূড়া। রক্তময়। সে কৃষ্ণচূড়া আজকের কৃষ্ণচূড়ার চাইতে অনেক বেশী লাল। সেই রক্তরঙীন কৃষ্ণচূড়ার দিকে তাকিয়ে পিয়াবৌদি বলেছিল—বাঃ! আমি সেদিন পিয়াবৌদির চোখে রঙীন কৃষ্ণচূড়ার কুঁড়িকে একটি দুটি করে পাপড়ি মেলতে দেখেছিলাম। সতেজ, কোমলতায় ভরপুর। গন্ধহীন অথচ আলোময়। সেই আলো স্পর্শ করে করে আমি পিয়া বৌদির পাশে গিয়ে ডেকেছিলাম—বৌদি!

—বল।

—ফুল নেবে?

হেসেছিল পিয়াবৌদি, বলেছিল—না।

মুহূর্তে আমার মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছিল—কেন?

—সুন্দর জিনিষ পেড়ো না।

—তোমার হাতে আরও সুন্দর হবে। বলেছিলাম আমি।

হাসিমাখা পিয়াবৌদির ঠোঁট বলেছিল—যেখানে যা মানায়

সেখানেই তা থাকা ভাল। আশ্রয়চ্যুত করলে তাকে ব্যথা দেওয়া হয় টুটুল। আমার চোখে তখন জলের অনেক স্রোত টলটল করছিল। হৃদপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু চুরি করে গাছে বসে হাসছিল কৃষ্ণচূড়া। লেকের জলের আর্দ্রতা মাখা লাল সূর্য্যকে দেখতে দেখতে আমি ভেবেছিলাম, পিয়াবৌদি বলেছে—যেখানে যা মানায় সেখানেই তা থাকা ভালো।

* * *

ট্যাক্সি তখন বেগবাগানে এসে পড়েছে, বহুক্ষণ বাদে পিয়াবৌদি জিজ্ঞেস করল—ববি কেমন আছে টুটুল?

ববি মানে আমার ভাইপো, পিয়াবৌদির একমাত্র সন্তান, কোলকাতার হোষ্টেলে থেকে পড়ছে। পিয়াবৌদি মেজদার সাথে সেই কাটনিতে। বললাম—ভালো।

—মাঝে মাঝে ওকে দেখে আসো তো?

—হ্যাঁ।

—বিকেলের দিকে যাবো কিন্তু ববির হোষ্টেলে। তুমি যাবে তো?

—যাবো।

* * *

—এবার যাই টুটুল।

—আরেকটু বসো না বৌদি।

—আমার ঘুম পাচ্ছে। হাই তুলেছিল পিয়াবৌদি।

আমি আঁচল টেনে ওকে আমার বিছনায় বসিয়ে দিয়ে বলেছিলাম,

—একটু বসো, এমন মজার কথা বলব যে, তোমার ঘুম চলে যাবে।

পিয়াবৌদির চোখের ঘুমন্ত কৃষ্ণচূড়া তখন ম্লান হয়ে দরজার দিকে চাইছিল। আমার অনেক কথা ছিল, আবার কোন কথা ছিল না। চুপ করে বসে তাই পিয়াবৌদির সেই আলোভরা মুখ দেখছিলাম। একটু পর পিয়াবৌদি আবার বলেছিল—এবার যাই।

—বসো না বৌদি। মিনতি করেছিলাম।

পিয়াবৌদি গলায় আরও মিনতি মেখে হেসে বলেছিল—দেরী করলে তোমার মেজদা বকবে।

আমি শক্তহাতের মুঠি আলগা করেছিলাম, আঁচল হেসে উঠেছিল। পিয়াবৌদি চলে গিয়েছিল ঘর থেকে।

আমি আমার বুকে এক বিরাট পাথরকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। বেরিয়ে এসেছিলাম বারান্দায়। বারান্দার পূর্ব প্রান্তে পিয়াবৌদির ঘরের দরজা বন্ধ। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল লেকের জলের পাশে কৃষ্ণচূড়ার তলায় দাঁড়িয়ে আমার মেজদা আর পিয়াবৌদি। মেজদার ঠোঁটের কৃষ্ণচূড়া পিয়াবৌদির হাতে। আমার বুকের পাথর তখন একটু একটু করে গলে এক বিরাট দীঘি। সে জলের স্রোত চোখে। স্তূপীকৃত শেওলার স্তূপ এই কণ্ঠনালীতে। বারান্দার রেলিং এর বাইরে রাতের আকাশ।

অন্ধকারের মাঝে মাঝে দু, চারটি তারা। আকাশ কত যত্নে সেই সন্ধ্যারাত থেকে বসে বসে তারা ফোটায়। কোনটা থাকে, কোনটা থাকে না। নিজের বুক থেকে খসে যায়। এই বুকে কত যত্নে কত দিন ধরে নিগূঢ় শব্দে এক কথা সাজানো হয়। সেই শোনানোর জনকে শোনানো হয় না, অন্যকে শোনাতে হয়। মালা-করে কত যত্নে মালা গাঁথে। সর্বশ্রেষ্ঠ মালাটি সর্বশ্রেষ্ঠ জনকে দিতে দিতে পারে না। অন্য কেউ নিয়ে যায়।

আমার বুকের পাথর তখন গলে গলে যে দীঘি বানিয়েছিল—তাতে পিয়াবৌদির চোখের কাছে ধরার জন্য যে পদ্মবীজ রেখেছিলাম, তাই সযত্নে রোপন করেছিলাম। বলেছিলাম, পিয়াবৌদি তুমি এই দীঘির তীরে বসে থেকো অনন্তকাল।

* * *

চলমান ট্যাক্সির ভেতর আমি ও পিয়াবৌদি। আমার পায়ের কাছে সুটকেশ অর্থাৎ পিয়াবৌদির প্রয়োজন। সহসা আমার কাছে সরে এল পিয়াবৌদি, নরম গলায় ডাকল — টুটুল!

আমি তাকালাম। পিয়াবৌদির ক্লান্ত চোখের তারা ম্লান। বিবর্ণ মুখে শুকনো কৃষ্ণচূড়ার কালচে রং এর ছোপ, ভাঁজে ভরা কপাল। পিয়াবৌদি ধীরে ধীরে বলে গেল—তুমি বদলে গেছ টুটুল।

আমি হাসলাম। ট্যাক্সির বাইরে রোদ, গাছ, পাখী, আকাশ, জনতা, দোকানপাট, পিচ ওঠা পথ, ঘুরে যাওয়া পৃথিবী। বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে পিয়াবৌদির চোখের দিকে তাকালাম, হেসে বললাম—সবই বদলায়।

———

❋ কবিতাগুচ্ছ

তার দেখা ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পথে পড়ে আছে চাঁদ, তাকে নাও তুলে,
সংকেতের মতো রাখো কৃষ্ণ সিঁথি মূলে
জঙ্গলের, আর নিজে পাহাড়ে দাঁড়াও—
চূড়ায়, আকাশ এসে তোমায় শুধাবে;
এ পথে নিঃশব্দে যাও, তার দেখা পাবে।
গাছ আছে, পাখি আছে, চাঁদ আছে জলে
ঐখানে ঢাকো মুখ শান্ত করতলে—
তার দেখা পাবে — যদি চাও
জলে শুয়ে আছে চাঁদ, তাকে তুলে নাও॥

তুমি ॥ কৃষ্ণ ধর

ওইখানে তুমি আছো, অতদূরে
কী করে পৌঁছুবো?
তুমি যেন মায়াবী প্রাসাদে বন্দী
নির্লিপ্ততা তোমার স্বভাব
ধূলিমুঠি ঝড়ে ওড়ে
তার দাস হৃদয়ে লাগে না।

দুপুরের ঠাঠা রোদে হেঁটে এসে
তোমার বুকের ওপর মাথা রাখলে
শীতল পাটির স্নান মেলে

সারাদিন হৈ হল্লা কলরব মওতার পর
বাড়ি ফিরে একা একা
তোমার শরীর ঘিরে
হৃদয়ের পূর্ণ নীরবতা।

তবু তুমি থাকো যেন মায়াবিনী পথের প্রতিমা
প্রকৃতই ভালোবাসা আছে কি আছে না?
নির্লিপ্ততা তোমার স্বভাব
তবু তুমি ফিরিয়ে দেবে না
হয়তো বা ধূলোবালি গায়ে লাগে
তার দাস হৃদয়ে পড়ে না।

সুংগলে, পালামপুরে ॥ হরপ্রসাদ মিত্র

গুঞ্জন

মেঘকে রাখবে ধরে, তাই কি পাহাড়ে
আকাশে তুলেছে আপনাকে?
দুপুরে বনুরি গ্রামে দেখলুম তাকে।

ছাখো, ছাখো বাঁশবন সালিয়ানা গ্রামে
ও বুঝি আখের ফুল? মনে হয় কাশ
নিমেষে নতুন দেশ,—
হোল্‌টায় একা এক চীড়।
দূরে পাঁচরুলি বুঝি?
বুকে খুশি লাগে কী গভীর!

সবুজ ঝাড়ের আলো—
এতো চীড় দেখিনি কখনো,
যখন ছাখেনা কেউ—
এরা সব জলে তো তখনো?
যে কেউ দেখ্‌তে আসে, তাকে মিনি, রাস্তা ছাখান,
তাঁরই নামে হিমালয়ে সব কথা হয়ে যায় গান।

বেদনা

ঘুরে ঘুরে নেমে যায় পথ—
ফিরে ফিরে পেছনে তাকায়;
পাহাড় হচ্ছে ক্রমে ফিকে নীল রেখা
ফাঁকা এক আকাশের গায়!

এ জীবনে কোন্ ক্ষণে কে কাছে আসে,
কে যে হেসে দূরে চলে যায়—
কে তার তালিকা থেকে
পুরোপুরি জীবনকে পায়?

ঘটনারা আসে যায়
যা থাকে তা বেদনা, বেদনা!
নিজেকেই বলি নিজে—
"কেঁদোনা, কেঁদোনা!"

কৌটোগুলো ॥ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কৌটোগুলো দেখে ভীষণ বিরক্ত।
বললাম, "এই জঞ্জাল জমিয়ে লাভ কী?"

তুমি হাসলে।
বললে :
"একটায় রাখতাম সুজি,
একটায় চিনি,
একটায় নুন,
আর একটায়—"

মুখ টিপে হাসলে—

কৌটোগুলো খালি। জীবনটার মতোই ফাঁকি।
হয়তো একটায় ছিল প্রথম দিনের ভালোবাসা।
কাকদের খড় কুটো দিয়ে
অশথ গাছে বাসা।

ফাঁকা কৌটোগুলো নিয়ে
পথে বেরুই।
খদ্দের চাই। কয়েকটা পয়সা পেলেই
সুরাহা হয়।

ফাঁকা কৌটোগুলো
ভীষণ বিরক্ত করছে॥

কবিতার দিন ॥ স্বপন রায়

রমণী শব্দের পল্লবিত বিন্যাস নয়কো আর
বুক থেকে ভাঙো হাড়
কবিতাকে করো ধারালো একটি তলোয়ার
ছুঁচ বিঁধে দাও ফাটাও ফানুস
কবিতাকে করো সত্যিকারের মানুষ
কবিতা, কবিতা, কবিতা আজ কবিতার দিন
কবিতা দিয়েই শুধে দিতে হবে সাতপুরুষের ঋণ।

কাকে ভালবাসা বলে ॥ কবিতা সিংহ

ভালোবাসা ভেঙে দিলে চারটি অক্ষর ভেঙে থাকে—
মাত্র ছত্রখান।
ভালোবাসা শিখে দিলে তার চেয়ে কি আছে লজ্জার
ভালোবাসা শুনে দিলে আরো খুব জোয়ালো পুরুষ
প্রতিদ্বন্দ্বী, পৃথিবীর সুখময় লোভ
নিজের লুকানো লোভ ঢাকা নখ খ-দন্ত খুলে দেয়
বিলোল যন্ত্রণা
ভালোবাসা নিজের দুপাশে দুটি শব্দ রাখে
অবোলা অদেখা।
একটি শব্দের নাম 'কাকে'?
একটি শব্দের নাম 'বলে'?
ভালোবাসা মানে তাই আমৃত্যু, একটিই জিজ্ঞাসা
কাকে ভালোবাসা বলে?
কাকে ঠিক বলে ভালোবাসা?

তোমার শরীর জুড়ে অন্ধকার ॥ অসীম রেজ

সুদূরতার সীমা নেই,
শব্দের শৃংখল থেকে কবিতা
আপন স্বভাবে উঠে বেড়ে,
জন্মের আগেই শিশু স্বকীয় বিকাশ চায়
আকাশের ভ্রূণ থেকে খসে পড়ে তারা,
আপন হৃদয় ভারে সেও পল্লবিত হতে চায়
বৃক্ষ নয়
জল ও মাটি
হৃদয়ের কাছাকাছি
ভালবাসার ঘ্রাণ নিতে গিয়ে
রস থেকে বাড়ে রসের তাগিদ,
অথবা তোমার শরীর জুড়ে
ধাতব অন্ধকার বাজে
তাই সুদূরতার সীমা নেই।

তিন টুকরো ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

১

চিরটাকাল বীজ বুনেছি ভুবনডাঙার মাঠে,
একটা বীজও বৃক্ষ হয়নি—এমনি আমার কপাল।
তপ্ত দেহ নীল হয়েছে রৌদ্রে পুড়ে পুড়ে,
রইল দেহ চিরটাকাল বৃক্ষছায়ার কাঙাল।

২

চাঁদের ঐশ্বর্য্য দেখে সমুদ্র সহস্র হাতে ডাকছিল যখন চন্দ্রকে,
বলেছি তোমাকে কাল একা পেয়ে, 'আমি ভালোবাসি'।
সাগর হেসেছে শুধু, তাই শুনে, অতিদূর নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে—
শুনেছি সারাটা রাত সাগরে ও চাঁদে হাসাহাসি।

৩

প্রথম স্বপ্নের রাতে আমি যুদ্ধ লিপ্ত হই,
ওড়াতে পারিনি কোনো জয়ের পতাকা।
ফিরতি স্বপ্নে জয় হবে—এ রকম ভাবতে ভাবতে ট্রেণে চড়ে বসি,
গন্তব্যে পৌঁছেই শুনি, বেদখল হয়ে গেছে স্বপ্নের এলাকা।

ছত্রাকের প্রতি ॥ অসীম বসু

যাকে তুমি রক্ষা করো রোদ বৃষ্টি থেকে
সে তোমার আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়
পরম প্রেয়সী নয় আবহমানের
হয়তো মমতা নয়, এই শুশ্রূষায়
নিভৃত ক্রোধের থেকে প্রাণ পেয়ে আবার উদ্যত হবে অকৃতজ্ঞ ফণা
পাপ, অথবা হিংসা, অথবা আক্রোশ অথবা গভীর অসময়
সব জানো, তুমি, সব জানো
তবে কোন্ প্রেমে নিজেকে বিলুপ্ত করো পরিত্রাতা রূপে
তোমার হৃদয়বত্তা আমাকে বিদগ্ধ করে যায় হে ছত্রাক
আমার শরীর আজ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে
আজ আমি প্রসন্ন প্রশাখা মেলে দিতে চাই
সকলের রৌদ্রক্লান্ত দরিদ্র আকাশে
যৌবনের হিতৈষী ভূমিকা নিয়ে আজ আমি মিশে যেতে চাই
দুঃখিত মুখের ভীড়ে।

Gram : WATERFLOW PHONE { 23-4144 / 23-1260

WITH THE BEST COMPLIMENTS FROM :

WATER SUPPLY SPECIALISTS Private LTD.
(THE PUMP MEN)

14, BENTICK STREET, (GUJRAT MANSION)
POST BOX 424 **CALCUTTA-1**

HERE WE ARE
FOR PROMPT SAFE & ECONOMICAL
TRANSPORTATION OF CARGO
DAILY BY ROAD AND AIR
TO
ASSAM • CACHAR • TRIPURA

Contract
SUREKA AIR TRANSPORT
PREMIER AIR & ROAD CARRIERS
(Authorised Agents of Indian Airlines)
119/B, Chittaranjan Avenue, Calcutta-7
Telephone No. 34-2884
34-2092

Branches :

Motor Stand	Kedar Road	Station Road	Janiganj
Agartala	Gauhati	Karimganj	Silchar
Phone : 839	Phone : 4615	Phone : 252	Phone : PP-76

With the Best Compliments of :

★

C. M. RAJGARHIA

120, CHITTARANJAN AVENUE,

CALCUTTA-700007

জয়া রায় কর্তৃক ৮/১০৩, বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২ হইতে প্রকাশিত এবং নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ ১৪, দুর্গা পিথুরী লেন, কলি-১২ হইতে মুদ্রিত।

দাম : পঞ্চাশ পয়সা